দৈনিক সংবাদ

তারিখ 06 NOV 1992 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা

।। দুর্লভ বিশ্বাস ।।

মির্জাপুর ঃ "শুন মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

বাংলা সাহিত্যের এই পংক্তি যিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে সেই মানুষের সেবায় আজীবন আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনিই হলেন দানবীর রনদা সাহা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যিনি কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ শুধু নিজের ভোগবিলাসের জন্য ব্যয় না করে মানবতার সেবায় অকৃত্রিমভাবে দান করেছেন তিনিই হলেন বিংশ শতাব্দীর হাতেম-কর্ণসম দাতা দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা।

বাংলা ১৩০২ সনের কার্তিক মাসের তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার টাংগাইল মহকুমার মির্জাপুর গ্রামের এক দরিদ্রের পর্ণকুটিরে জন্ম হয় দানবীর রনদা প্রসাদ সাহার। তার পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ সাহা এবং মাতার নাম কুমুদিনী সাহা।

আজ ৬ই নভেম্বর দানবীর রনদা প্রসাদ সাহার ৯৭তম জন্মবার্ষিকী।

দারিদ্রের মাঝেই রনদার জন্ম। জন্মেই তিনি দেখেছেন অভাব অনটন সংসারে লেগেই আছে। কারণ তার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সামান্য ওষুধ বিক্রেতা। এতে তার যে আয় হত তা দিয়ে একবেলা আহার জুটেছে তো আরেক বেলার জুটেনি। মা কুমুদিনীর স্নেহ আর চরম দারিদ্রের মধ্যেই তার বাল্যজীবন শুরু হয়। বালক রনদার বয়স যখন সবেমাত্র ৫ বছর তখন প্রায় বিনাচিকিৎসায় তার মা কুমুদিনী মারা যান। এরপর রনদার বাবা দ্বিতীয়বার কোকন দাসী (শুভাসুন্দরী)কে বিয়ে করেন।

মাতৃহারা রনদা তাকে আপন মা হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু বিমাতা তার প্রতি মোটেই সদয় ছিলেন না। তাই মাত্র ৮ বছর বয়সে রনদা তার পিতার সামান্য ব্যবসাতে শরিক হতে বাধ্য হন। কিন্তু তাদের আর্থিক সংকট বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

একদিকে অভাব-অনটন, অন্যদিকে বিমাতার এই হৃদয়হীন আচরণের মাঝেই রনদা বড় হতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর্ব তিনি শেষ করতে পারেননি। ঘরে বিমাতার নির্মম আচরণ, বাইরে আর্থিক হাহাকার— এই অবস্থায় কিশোর রনদা ১৫ বছর বয়সে ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতা চলে যান।

কিশোর রনদা ভাগ্য অন্বেষণে কলকাতা গিয়ে এমন কোন কাজ নেই যা তিনি করেননি। পেয়াদার কাজ। রিক্সাওয়ালা এবং ফেরিওয়ালার কাজসহ বেঁচে থাকার জন্য সব কাজই তিনি করেছেন। জানা যায়ঃ মাত্র ছয় আনার বিনিময়ে রনদা একবার এক ইংরেজ সাহেবের গাড়ি, অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পরিষ্কার করে দিয়ে তার কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন।

আরেকদিন রনদা কলকাতার রেল ষ্টেশনে খবরের কাগজ বিক্রি করছিলেন। তখন ঐ ষ্টেশন অভিমুখে একটি ট্রেন দ্রুতগতিতে আসছিল। এমন সময় একটি শিশু হঠাৎ চলন্ত ট্রেনের সামনে গিয়ে পড়ে। সমস্ত লোকজন হায় হায় করে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু কেউ শিশুটিকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসল না। ষ্টেশনময় জনতার ভিড় ঠেলে বিক্রির জন্য হাতের খবরের কাগজগুলো ফেলে দিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে রনদা শিশুটিকে রক্ষা করলেন। শিশুটির পিতা এজন্য রনদাকে দশটি টাকা পুরস্কার দিতে চাইলে রনদা

রনদা প্রসাদ

তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

শত চেষ্টা করেও রনদা তার আর্থিক সংকট নিরসনে কিছুই করতে পারছিলেন না। এমনি সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রুষা করার জন্য দলে দলে বাংলার যুবকরা বাংগালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করতে লাগল। রনদাও সেদিন বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করেন।

আর্তের সেবক রনদা বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নিজের জীবনের মায়াকে তুচ্ছ করে আহত সৈনিকদের সেবা করেছেন। একদিন বাগদাদ সেনানিবাসে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে সে আগুন সমস্ত সেনানিবাসে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সেনানিবাসে আহত সৈনিকরাও ছিল। তুর্কী ফায়ার ব্রিগেড সে আগুন আয়ত্তে আনতে পারছিল না। এমন সময় রনদা সেনানিবাসের অফিসার ডাক্তার কিংসের কাছে সেনানিবাসে আশ্রিত আহত সৈনিকদের আগুনের লেলিহান শিখা থেকে উদ্ধারের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। প্রথমে তিনি অনুমতি দিতে রাজী হলেন না। কিন্তু রনদার পীড়াপীড়িতে অবশেষে রনদাকে অনুমতি দেয়া হলো। রনদা নিজের জীবনের মায়াকে উপেক্ষা করে মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই অগ্নিকুন্ডলীর মধ্যে যেখানে আহত সৈনিকরা নিশ্চিত মৃত্যুর প্রহর গুনছিল। রনদার এই সাহস দেখে তার সঙ্গীরাও আহতদের উদ্ধারকাজে শরিক হলেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ২০ জন আহত সৈনিক নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। রনদার এই বীরত্বময় আত্মত্যাগের সংবাদ সমস্ত সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে গেল। তিনি ইংরেজ সামরিক বাহিনীর সুনজরে আসলেন এবং একের পর এক পদোন্নতি পেলেন। এরপর বাগদাদ থেকে করাচী ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয় তাকে। এরপর রনদাকে বদলি করা হয় ইস্তাম্বুলে।

রণাঙ্গনে রনদার সাহস, অপূর্ব রণকৌশল এবং আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে বিশেষ সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এই সার্টিফিকেটের মাধ্যমে রনদা পরে রেলওয়েতে টিটির চাকরি পান। কিন্তু কিছুদিন চাকরি করার পর তার সে চাকরি চলে যায়। এরপর রনদা কলকাতায় কিছুদিন কয়লার ব্যবসা করেন।। এই কয়লার ব্যবসার মাধ্যমেই ভাগ্যলক্ষী রনদার প্রতি সুপ্রসন্ন হতে লাগল এবং পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে রনদা আবার তার মাতৃভূমি মির্জাপুরে ফিরে আসেন।

কয়লার ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত পুঁজি নিয়ে মাতৃভূমিতে এসেই তিনি ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

নিঃস্ব, নিঃসম্বল, ক্ষুধাক্লিষ্ট রনদা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েও শুধু অর্থ সঞ্চয় এবং ভোগবিলাসে লিপ্ত হলেন না। গরীবের কি কষ্ট, দুঃখীর কি দুঃখ, পীড়ার কি মর্মান্তিক জ্বালা যা তিনি ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে উপলব্ধি করেছেন, সেই রনদা কি মানবতার চরম দুঃসময়ে নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেন?

তাই ১৩৫০ সনের সেই মহাদুর্ভিক্ষে খাদ্যের অভাবে যখন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল, মানবতার এমনি চরম দুঃসময়ে রনদা সেই আর্ত-মানবতার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, নরসিংদী, টাংগাইল, এমনকি কলকাতায় পর্যন্ত ২১টি লঙ্গরখানা খুলে তিনি দুর্ভিক্ষকবলিত মানবতাকে উদ্ধারে প্রচেষ্টা চালান। এর একেকটি লঙ্গরখানায় প্রতিদিন হাজার হাজার লোকের খাদ্যের সংস্থান হত। '৫০-এর সেই দুর্ভিক্ষের সময় রনদার লঙ্গরখানাগুলো ৬ মাস পর্যন্ত চালু ছিল।

এ অবস্থার মোকাবেলার পর পরই তিনি মির্জাপুরে তার জননী "কুমুদিনীর" নামানুসারে ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন দাতব্য চিকিৎসালয় কুমুদিনী হাসপাতাল।

স্বাধীনতার পূর্বে এই হাসপাতালে শয্যা ছিল মোট ১২শ'। বর্তমানে এই হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ৭৫০।

রনদা প্রসাদ সাহা শুধু আর্তের সেবক, পীড়িতের আপনজনই ছিলেন না, শিক্ষা বিস্তারেও রনদার দান অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে 'ভারতেশ্বরী হোমস'। চল্লিশ দশকের তৎকালীন পূর্ববাংলায় নারী শিক্ষার সুযোগ বলতে গেলে কিছুই ছিল না। তাই প্রথমে তিনি নারী জাতিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য কুমুদিনী হাসপাতালের পার্শ্ববর্তী স্থানে তার ঠাকুর মাতার নামানুসারে আধুনিক নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "ভারতেশ্বরী হোমস" প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রীসংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১২শ'।

শিক্ষাবিস্তারে দানবীর রনদা প্রসাদ সাহার আরেক অমর অক্ষয় প্রতিষ্ঠান মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ।

রনদা প্রসাদ সাহার শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অপর অবিনশ্বর কীর্তির নাম 'টাঙ্গাইল কুমুদিনী গার্লস কলেজ'। তৎকালীন টাংগাইল মহকুমার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার প্রসারিত করার লক্ষ্যেই তিনি ১৯৪৩ সালে টাংগাইল শহরের বিরাট এলাকা জুড়ে তার মায়ের নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করেন "কুমুদিনী গার্লস কলেজ।"

বিরাট এলাকা জুড়ে মির্জাপুর মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান দ্বিতল অট্টালিকাটিও দানবীর রনদা প্রসাদ সাহার নিজ হাতে গড়া। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' এবং স্থানীয় সুধীবৃন্দের সাথে সম্পাদিত এক চুক্তির মাধ্যমে মির্জাপুর মহাবিদ্যালয় মনোরম পরিবেশে অবস্থিত এই ভবনটি লাভ করে। দানবীর রনদা প্রসাদ সাহার শিক্ষাবিস্তারে অনন্য অবদানের একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর হল বর্তমান মির্জাপুর এস, কে, পাইলট হাই স্কুল।

এদেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য এছাড়াও দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা আরো বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করেছেন।

দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা আর্তের সেবা এবং শিক্ষাবিস্তারে অনন্য অবদান রাখার পাশাপাশি এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন।

'৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগীদের হিংস্র থাবা থেকে যেমনিভাবে রক্ষা পায়নি বাংলার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা, ঠিক তেমনিভাবে তাদের হিংস্র থাবা থেকে রক্ষা পায়নি দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা। যে মানুষটি নিজের শ্রমে উপার্জিত ধন-সম্পদ শুধু ভোগবিলাসে ব্যয় না করে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের জন্য এতো কিছু করলেন তাকেও রেহাই দেয়নি পাকবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় সহযোগীরা। ১৯৭১ সালের ৭ই মে পাক হানাদার বাহিনীর স্থানীয় সহযোগী তথাকথিত শান্তি কমিটির নেতা জনৈক মাওলানার ষড়যন্ত্রে ও সহযোগিতায় গভীর রাতে নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায় আর্তের সেবক, পীড়িতের বন্ধু, মানবতার পূজারী দানবীর রনদা প্রসাদ সাহা এবং তার ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহা রবিকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এযুগের হাতেম-কর্ণসম দাতা দানবীর রনদা প্রসাদ সাহার কোন খোঁজ নেই।